KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication : ৩৩ বিশ্বনাথ মুখার্জি রোড (রেস্তোরাঁর উপরে নং ২) কলকাতা - ১২
Collection : KLMLGK	Publisher : শ্রীযুক্ত নরেন বিশ্বাস
Title : অনুভব (ANUBHAV)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 1/1 1/3 1/4 1/8 1/11 2/7	Year of Publication : July 1974 Sep 1974 Oct - Nov 1974 Feb - March 1975 July 1975 / Jan 1976
	Condition : Brittle Good
Editor	Remarks

CD Rod No : KLMLGK

জয়ন্ত কুমার সম্পাদিত

অনুভব

কবিতার মাসিক

অনুভব

নবপর্যায় ॥ বর্ষ ১ সংখ্যা ৩
সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

কবিতা, শিল্পীর দৃষ্টিতে

কবি ও শিল্পীদের একটা যুক্তফ্রন্ট দরকার

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

কথাটা ভাবছি অনেকদিন ধরেই, কবি ও শিল্পীদের নিয়ে একটা যুক্তফ্রন্ট গঠন করা দরকার। কিন্তু তেমন কাউকে উদ্যোগ নিতে দেখছি না বলে সাহসেও অকুলান ঘটছে। প্রায় বছর দুয়েক আগে, অগ্রজ কবি শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিক 'যুগান্তরে' একটি প্রবন্ধ লিখে কবি ও শিল্পীদের সম্মিলিত হবার অহ্বান জানিয়ে কিছু কার্যকরী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, মনে পড়ে।

এখন কবিরা মাঝে মাঝে কবি-সম্মেলন করেন, হৈ-হুল্লোড় করেন মন্দ না, কিন্তু শিল্পীদের ডাক পড়ে না সেখানে। আবার শিল্পীরা যখন কনভেনশান করেন, দল গড়েন, তখন কবিরা থাকেন অপাংক্তেয়। কিন্তু কেন? সেটাই আমি বুঝতে পারি না। এরকম সাম্প্রদায়িকতায় আমার কষ্ট হয়। বরং ভাবি, যেখানে বিষয়ের ঐক্য রয়েছে, সেখানে মাধ্যমের ভিন্নতা কখনো স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে না।

কবি নিজেকে প্রকাশ করেন ভাষার সঙ্কেতে, আর চিত্রীর প্রকাশ-মাধ্যম তার রঙ ও রেখা। শব্দের মধ্যে আমরা যে ধ্বনিময়তাকে পাই, তা কানের ভেতর দিয়ে আমাদের রক্তের গভীরে গিয়ে কম্পন জাগায়। অন্যদিকে ছবির বর্ণময়তা ও রৈখিক-বিন্যাস আমাদের দৃষ্টিকে কেবল আচ্ছন্ন করে না, তার আবেদন হৃদয়ের গভীরে গিয়ে কবিতার অনুরূপ আবহ তৈরী করে। যদি তা না হত—শিল্পীর অন্তর্বাসনার সঙ্গে কবির অন্তর্বাসনার মিল থাকত না—তাহলে সুররিয়্যালিস্ট আন্দোলন ফ্রান্সের সীমা ছাড়িয়ে এতটা ব্যাপকতা পেত না। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা বাঙালি কবি-শিল্পীরা বিভক্ত মানসিকতার শিকার।

আমি বিশ্বাস করি, ছবি ও কবিতা প্রায়শ পরস্পরের পরিপূরক এবং কখনো কখনো সমধর্মী। পাথরের মূর্তিতে ঘোড়ার যে-গতিশীল স্তব্ধতাকে আমি প্রত্যক্ষ করি, কবিতার শব্দচিত্রে ও ধ্বনিময়তায় আমি ওনি তারই খটখটে পায়ের শব্দ।

কেউ যদি আমার এই দেখাকে দৃষ্টির বিভ্রম এবং শোনাকে শ্রুতির বিভ্রাট বলে উল্লেখ করতে চান, তাহলে আমি মেনে নিতে নারাজ।

এখানে কবি ও শিল্পীর সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন ওঠে না। সব মাধ্যমেরই কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষের সূক্ষ্মতম ভাবাবেগের প্রকাশে ভাষা এখনো যথেষ্ট ইঙ্গিতময় হয়ে উঠতে পারেনি, রঙ-রেখার অকৃপণ আয়োজন নিয়েও শিল্পী প্রায়শ অসহায়। তবুও ছবির ভাষা কবির পক্ষে যতটা জানা সম্ভব, অন্য কারো পক্ষে ততটা সম্ভব নয়। অন্যদিকে কবির উপলব্ধিকে অনেক সার্থকভাবে ভিসুয়েলাইজ করতে পারেন শিল্পী।

আসলে, কবি ও চিত্রকর সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মে নিয়তির মতো পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসতে বাধ্য। সেজন্যই রঙ ও রেখা দিয়ে শিল্পীকে লিখতে হয় কবিতা এবং ভাষার সাহায্যে কবিকে আঁকতে হয় ছবি।

তাই বলে, আমি একথা বলি না, কবিরা ছবি দেখে দেখে কবিতা লিখবেন কিংবা শিল্পীরা কবিতা পড়ে পড়ে সংগ্রহ করবেন ছবির বিষয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন, এটাই কাম্য। কিন্তু সম্পর্কের স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করলে পারস্পরিক দূরত্ব অকারণে বেড়ে যায়। সেই দূরত্বকে কমিয়ে আনলে উভয়েরই মঙ্গল হবে, এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কেননা, ছবির একজন ভালো দর্শক হতে পারেন একজন কবি এবং শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন কবিতার একজন সুপাঠক। উভয়ের শক্তি সম্মিলিত হলে গোটা দেশের সাংস্কৃতিক চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখার ফাঁকে ফাঁকে ছবি আঁকায় মনোযোগ দিয়েছিলেন, এবং অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকায় বিরতি ঘটিয়ে লিখে গেছেন ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো আংলা, রাজ-কাহিনীর গল্পগুলি। এইসব ঘটনাকে আমি বিচ্ছিন্ন বা খাপছাড়া দৃষ্টান্ত বলে ভাবতে পারি না। গগন ঠাকুরের আঁকা 'রক্ত করবী'র ছবিগুলি কি নিছক ইলাস্ট্রেশান? নাকি নিজের লেখা 'ভোদর বাহাদুরের' ছবিগুলি গগন ঠাকুর এঁকেছিলেন নিছক অঙ্গসজ্জার জন্য?

না, অনান্তরিক কোনো প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না। এরা টিকে গেছে ক্ষমতার জোরে। ছবিগুলি ছবিই হয়েছে, ইলাস্ট্রেশান হয়নি। সেকালের প্রবাসী, বসুমতী, বিচিত্রা প্রভৃতি কাগজে নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সুশীল সেন, চিন্তামণি কর, গোপাল ঘোষ, প্রদোষ দাশগুপ্ত, মাখন দত্তগুপ্ত প্রমুখ অনেকেই ছবি এঁকেছেন। এবং সেসব ছবি এখনো উল্লেখযোগ্য বলেই বিবেচনার যোগ্য।

তাহলে, আমরা এখন কি করছি?

বিষ্ণু দে যামিনী রায়কে স্বদেশে এবং বিদেশে জনপ্রিয় করেছেন তাঁর ছবির বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা করে। আর কোন্ কবি ছবির এমন মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করতে

পরেছেন? সেটা কবিদের দোষ নয়। বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে যামিনী রায়ের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার ফলে যা সম্ভব হয়েছে, অন্য কোনো শক্তিশালী শিল্পীর সঙ্গে অন্য কোনো শক্তিশালী কবির অনুরূপ যোগাযোগ ঘটলেও, তাই সম্ভব হত হয়তো-বা। রামকিঙ্করকে তেমনভাবে তুলে ধরবার মতো লোক থাকলে, আমি বিশ্বাস করি, তাঁর খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী হত। এত বড় শক্তিশালী ভাস্কর স্মরণীয় কালে বাংলাদেশে জন্মায়নি।

দু'একটা বিদেশী দৃষ্টান্ত দিই। তাহলে কবিতার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্কটা কত গভীর, তা এদেশী পাঠকের কাছে সহজবোধ্য হবে।

পিকাসো ছবি আঁকতেন। সেই ছবির জনপ্রিয়তায় আমরা ভুলে গিয়েছি, কবিতা লেখায় তাঁর আগ্রহ ছিল কম না। কাফ্‌কার ডায়েরীর পাতায় পাতায় পাওয়া গেছে অজস্র রেখাচিত্র। মনের বিখ্যাত 'ওফেলিয়া' ছবিটিও কবিতার ইলাস্ট্রেশান। আমরা কি ভুলতে পারি, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, বড় বড় কবিদের কবিতা নিয়ে ছবি আঁকার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল ইংলণ্ডে? কনস্টেবল সামুদ্রিক ঝড়ের যে ছবি এঁকে ইমপ্রেশানিজমের সূত্রপাত করেন, সেই ছবিটি কোলরিজের 'অ্যানসিয়েন্ট মেরিনার' অবলম্বনে রচিত। এবং সমরসেট মম, ঔপন্যাসিক হিসেবে বহুল পরিচিত হলেও, ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর কলা-সমালোচক।

এসব দৃষ্টান্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে যখন নিজেদের দিকে তাকাই, তখন দেখি, কবিতা ও শিল্পের মধ্যবর্তী ভূমিতে ইদানীং কুয়াশা নেমেছে গাঢ় হয়ে। এই পরিস্থিতি কারো কাছেই কাম্য নয়। গোটা বাংলাদেশ ও তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে উপলব্ধি করার জন্যেও প্রয়োজন পারস্পরিক যোগাযোগের, আলাপ-আলোচনার। আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করি। কেননা, বিচ্ছিন্নতা মানেই মৃত্যু, কূপমণ্ডুকতা। সংযোগ মানেই আত্মবিস্তার।

কবিরা কি ছবি বোঝেন না? অল্পবিস্তর বোঝেন নিশ্চয়ই। যদি কোথাও অসুবিধে ঘটে, তাহলে তাও দূর হতে পারে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে। অভিনেতাদের মধ্যে পাহাড়ী সান্যাল, সাহিত্যিকদের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষ এবং কবিদের মধ্যে গৌরাঙ্গ ভৌমিককে আমি একাধিক প্রদর্শনীতে নিবিষ্ট হয়ে ছবি দেখতে দেখেছি। আগ্রহ না থাকলে নিশ্চয়ই তাঁরা প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে অকারণে সময় নষ্ট করতেন না।

যদ্দুর মনে পড়ে, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক কবিই বেশ একটি ভালো আড্ডা গড়ে তুলেছিলেন আর্টিস্ট্রি হাউসকে কেন্দ্র করে। এই আড্ডায় প্রকাশ কর্মকার, অরুন্ধতী রায় চৌধুরী, সুনীল দাশ (ইনি অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন), মিলু ব্যানার্জী, অনীতা রায় চৌধুরীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি আমিও। হায়, ওঁরা কি এখন পলাতক? এখনই ওঁদের উদ্দেশে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা উচিত।

কবিতা পড়ুন, কবির হস্তাক্ষরে

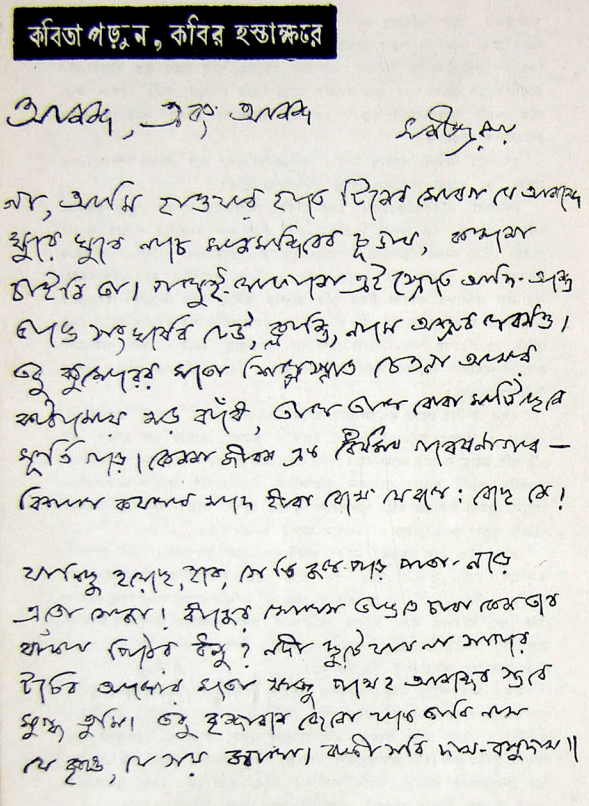

কোনদিকে যাব ।। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সব সময় কেবল যাবার কথা মনে হয়,
কিন্তু কোনদিকে যাব !
সূর্য তো যায় না কোথাও
প্রতিদিন ফিরে ফিরে আসে ;
সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্যাহত তার
নিঃশব্দ পরিক্রমা ।
কিংবা রাতের ওই চাঁদ,
সেও এসে দাঁড়ায় মেঘেদের সিঁড়ি ভেঙে
এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে দিয়ে
বারবার প্রতি শুক্লপক্ষের দর্পণে ।

অথচ আমার কেবলই যাবার কথা মনে হয় ।
কেননা ঘর এতো নড়বড়ে, মনে হয়
যে-কোনো নিমেষে মাথায় ভেঙে পড়তে পারে ।
কিন্তু কোনদিকে যাব,
আমার চতুর্দিকে সময়ের মরুভূমি ধূ-ধূ জ্বলছে ॥

যাও, ঘরে ফিরে দ্যাখো ।। অমিতাভ দাশগুপ্ত

যাও।
ঘরে গিয়ে দ্যাখো, সে ফিরেছে কিনা।
যদি ফেরে, তাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না,
তার মত থাকতে দাও তাকে,
ঘরভেদি-ডাকে
কে তাকে ফুসলেছিল,
নিয়ে গিয়েছিল কতদূর,
টবে তার পুঁতেছিল ফুলগাছ না বিষ-ধুতুরা,
জিজ্ঞাসা কোরো না,
যাও,
ঘরে গিয়ে দ্যাখো, খুব হেঁটে সে ফিরেছে কিনা।

আইঢালা ডগোমগো। ঘামে ভিজে প্রতিমার মুখ।
বলির জোকারে জাগে লোল পুরোহিত
জাগে আস্তিকের কাম,
মহামেদিনীর মত নিতম্ব বিছিয়ে নারী জানায় প্রণাম,
এ সব কিছুর দূরে
দূরে এসে পড়েছে শুয়ে সে,
ও-ভূগোল তোমারও অজানা—
যাও, ঘরে ফিরে যাও।
তাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।

অন্ধকারে আরো কাছে এসো ।। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

জ্ব'লে উঠেছিলো, কিন্তু আজ নিভে গেছে।
অন্ধকার। অন্ধকারে আমরা একাকী।
বন্ধুরা, আরো কাছে এসো।
শত্রু হে, তুমি তো আসবেই, কাছে এসো।
প্রেমিকারা, বড়ো দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, কাছে এসো।
কাছে এসো, সমস্ত জীবন।

মুখে খড়কুটো নিয়ে যে পাখি এসেছে, তার কাছে
সাইকেল নামিয়ে রেখে যে ছেলে আসছে, তার কাছে
যে ভাঙা-বিনুনি নিয়ে দৌড়ে গেলো, আজ তারো কাছে
আমি করজোড়ে বলি ঃ এসো, কাছে এসো,

অন্ধকারে আমরা কেন এখনো একাকী ?

অনর্থ ।। বিজয়া মুখোপাধ্যায়

মনে কোন পাপ ছিল না
মন ছিল না অঙ্গে
জীবন হল বাতিল, শুধু
কপাল গেল সঙ্গে।
দেহের ওজন খুব বেশি নয়
কিলো'য় ফর্টিফোর
কপাল কিন্তু বিষম ভারি
দীর্ঘায়ু সত্তর।
গণক ঠাকুর বাতলে দিলেন
যজ্ঞ, স্বস্ত্যয়ন
ফর্দ গেল হাওয়ায় উড়ে
রইল মন-কেমন।

এবারের গ্রীষ্মকাল ।। কালীকৃষ্ণ গুহ

এবারের গ্রীষ্মকাল তোমরা কিভাবে কাটাচ্ছো ?
তোমাদের জীবনযাপনের মধ্যে কিভাবে জায়গা ক'রে নিচ্ছে ভালোবাসা ?
তোমাদের ছোট বোনের কপালের বেগুনি টিপ এই গ্রীষ্মকাল-কে
অন্যরকমভাবে ছুঁয়ে দিচ্ছে ।
তোমাদের অথর্ব বাবা কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার থেকে বোবার মতো
শব্দ করছেন, আর
হস্টেল থেকে-আসা বড়োবোন শিউরে উঠে থামিয়ে দিচ্ছে অতুলপ্রসাদের গান ।

এবারের গ্রীষ্মকাল কিভাবে কাটাচ্ছো তোমরা ?

আমার জীবন ঘিরে পাতা এবং শুকনো পাতা জমা হয়ে উঠছে ক্রমশ
আমি আজ আবেগহীন ভাবে জেনে নিতে চাই এখন কিরকম আছে
অধীর সরকার—
এই তো হাতের কাছে রয়েছে তার সম্মান না-পাওয়া নীল মলাটের
কবিতার বই —
এবারের গ্রীষ্মে আমি জেনে নিতে চাই কেন রহস্য এবং পতনশীলতার দিকে
চ'লে যাচ্ছে তোমাদের মায়াময় পরিবার ।

গ্রীষ্মের দুপুরে তুমি স্নান করো, তোমাদের ছোট বোন স্নান করে,
তোমাদের বাবাকেও স্নান করিয়ে দেওয়া হয়—
বিকেলবেলা অন্ধকার কাক উড়ে যায় তোমাদের বাড়ির চিলে কোঠার উপর দিয়ে
তোমাদের রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করে বিড়াল—
গুণ গুণ ক'রে অতুলপ্রসাদের গান করে তোমাদের হস্টেল থেকে আসা
ইস্কুল-মাস্টার বোন ।
আমি একটিও প্রশ্ন না ক'রে এই গ্রীষ্মকাল কাটিয়ে দেবো ভেবেছিলাম
কিন্তু দ্যাখো, আমার জীবনের ভিতরে জমা হচ্ছে ডায়রীর পুরোনো পাতা,
ক্যালেণ্ডার, উপনিষদ থেকে তুলে-আনা
পারস্পর্যহীন স্তোত্র

॥ ২ ॥

আমারই নির্নীয়মান পৃথিবী থেকে ক্রমশ স'রে যাচ্ছি আমি—
কিছুই ভালো লাগে না আমার ।

ভণ্ড এবং অহঙ্কারী মানুষের কাছে গিয়ে আমি দেখেছি তাদের বিপদ এবং
ছিন্নপত্র দিন, অন্ধকার আকাশ—

বিশ্রামের ভিতর থেকে সহসা কে কার জন্য হাহাকার ক'রে ওঠে ?
নতুন ক'রে জেগে উঠতে চায় কবি ?
কেন আজও অস্পষ্ট হ'য়ে র'য়েছে তার পাপ-পুণ্যহীন জীবন এবং নিয়তি ?

সমস্ত গ্রীষ্মকাল জুড়ে আমাকে অন্তর্বাস নারী, দেখিয়েছে প্রেম, চর্যাহীন আনন,
বাচালতা ।

এইসব অনেকদিন তো হ'লো, এখন ক্রমশ বিবর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে আমার
বেঁচে থাকা—
এখন অন্ধকার দিনে একবার দু'বার কে পাশ থেকে ডেকে যায় ? মৃত্যু ?

মধ্যরাতে ।। জয়ন্ত কুমার

মধ্যরাতে কে আমাকে ডাকে ?
ঘড়ির ডায়াল দেখে মনে হলো, আমি আছি
প্রাথিত ঋতুতে !

এখন শৈশব নয়, সন্ন্যাসের কাল ।

বিনীত দুহাত দিয়ে দরজা খুলে দেখি,
দেয়ালে আলোর ছায়া—
ত্রিশূল ! ত্রিশূল !
সমস্ত সময় যেন আহত ঘোড়ার মতো ডাকে !

মধ্যরাতে টেলিফোন ? টেলিফোনে
কে আমাকে ডাকে ? আমাকে সাবধান করে—
বসন্তে, বৈশাখে !

অজয় নাগ

কবিতাবলী

॥ ১ ॥ *রাগরাগিণী*

পায়ে গায়ে ছায়াধীন মায়ামুকুর গুঁড়িয়ে যায়। ভাঙা মানুষের মুখের ধুলো নিজস্ব ঘামে ধুয়ে বিমান বেজে ওঠে। ওই দ্যাখো চন্দন দরোজা খুলে··· উজ্জ্বল আকাশ···রাস্তার ইতস্ততঃ রক্তের দাগে ফুল ফুটে ওঠে···শস্যক্ষেত্র ঘিরে মঙ্গলদীপ— গ্রহ নক্ষত্র জ্বলতে থাকে···নীল সুমুদ্রের ফেনিল স্বপ্নেরা খেলা করে নব-পত্রিকার তলে···আমের পল্লব চামর দোলায় মানুষজনের মাথায়···সেবাদাসীর মত খরস্রোতা নদী নেচে বেড়ায়—মুক্ত পয়ার···শব্দের স্ত্রীরাগে গান শোনায় বয়স্কা প্রকৃতি

জেগে ওঠা ভব্য পাথরের ঘরে ঘরে শিশু দেবতার স্থপতিরা—রূপ দাও বিজয় মিনারের···তার তুঙ্গ চূড়ায় রৌদ্র-রক্তাক্ত শিশির ঢালো···ভিতর-আসনে আঁকো শহীদ মানবিক তীক্ষ্ণ জ্যোৎস্নাময় নাম

পরস্পর করতল রক্তে বিশ্বাসের আলিঙ্গন করি···ওসো সবাই—

॥ ২ ॥ *টুপি*

আমার জরির টুপি সাগরের জলে
অগোপন ভেসে যায় প্রহত ভূগোল
মত্ত তুমি ভুলেছিলে মুগ্ধ মধ্যযামে
বীজ থেকে শস্যপাতি কর্ষনের হলে
রক্তচক্ষু চেয়ে থাকে—নিমজ্জিত পূষা
ইচ্ছা যত বনাস্থতী ব্যর্থ কাম-ঘামে
তোমার বসন্তকাল কীটভ্রষ্ট ফুল
বহমান শ্বাসাঘাতে করেছিলে ভুল

আমার জরির টুপি অনুতাপে জ্বলে
তুমি ছন্দ রেখেছিলে ভুল প্রনিধানে
রজঃছত্র ছায়া ফেলে ঋক্– হোমানলে
যতটুকু দাও তুমি সংঘ সন্নিধানে
সবটাই কুলুধ্বনি কপিশ কন্দরে
আলোকিত ঘন নীড় সায়র অন্তরে

॥ ৩ ॥ *সর্বক্ষণ মেঘ*

লম্বা হাত কতদূর যেতে পারে—কতদূর
কোন সীমানার বেড়া তাকে খুলে দেয় অন্তপুর
ভয়াবহ একটানা মেঘ সর্বক্ষণ ঝুলে থাকে
মাথার ওপর ঠিক কখনো কোথাও লুপ্ত থাকে আবছায়া
কোনো চোখ দেখে ফেলে গভীর অতল দূর থেকে
ঠিক ঠিক চিনবার কিন্তু চিহ্ন নেই—কিছুই থাকে না···
'এর কোন মানে নেই'—দু'হাতে চেতনা ছিঁড়ে ফেলা—
যাবতীয় পদতলে নিমিত গোলাপ-দীর্ঘ জন্ম

বিস্মরণ ক্ষমা মানসিক নড়াচড়া সুখেদুখে
যে রকম বেঁচে থাকা জীবন জীবনী ছাপোষার
লোভী হাত যায় যাক— যতদূর যেতে পারে—
মৃত্যুর বাইরে নাকি ?
মেঘ জমে ভয়াবহ কোথায় আড়ালে—স্বতাবতঃ
সময় হয়নি তার এখানো ভেঙে গড়বার !

॥ ৪ ॥ *মোজা*

বেলা বেশি শীতের রোদের শরীর ঝিমোয় আরামে—খেলা ভুলে-যাওয়া খেলা মনে পড়ে···স্মৃতি-সর্বস্ব অবিকল পাতা নাড়ে কাছ থেকে দূরের। ফিরে আসে না চেনা প্রস্রবনের সময়···সবাই নিয়মিত মৃতি। ···একটু পরেই তো এইখানে মৌসুমী নাটক শুরু হবে ঃ চরিত্রেরা প্রস্তুত···বহুরূপী শব্দ নায়িকার চুলের ছায়ায় ওড়াউড়ি করবে। ফুসমন্তর রামধনু মান্যবর নায়কের হাতের নাগালে···

কাঁচি-ছাটা নিমিত উদ্যান—নীল সামিয়ানার নিচে সাড়ে আট ইঞ্চি ডালিয়া মুখ ধোয় ঝারির শোধন-জলে। চুপচাপ সবুজ রঙের ঘাস। এতটুকু তপ্ততা নেই কোথাও···

রৌদ্র মেঘের মত স্বপ্নে গরম-মোজা বুনে যাবে বিধবার নিত্য দু'হাত—

কেন কবিতা

দেবী রায়

কেন কবিতা লিখি ? তার চেয়ে একটু ঘুরিয়ে যদি লিখি, এই পৃথিবীর মন্দ ভালো হিংসা-অহিংসা-ভিয়েৎনাম-আরব-ইস্রায়েল সব শিকেয় তুলে, কিছুদিন কোমর বেঁধে কাজ করি আসুন না' বল্‌লে, বেশীরভাগ মানুষই তেড়ে মারতে আসবে—একদল মানুষ বেশীর ভাগ মানুষকে এক্সপ্লয়েট করছে সে তো পিতৃ-পিতামহের আমল থেকে—লেকচার মেরে, বক্তৃতা ঝেড়ে থামানো গেছে ? ওয়াগন ভরতি গম কেন ইঁদুরের পেটে যায়, কেন বেশির ভাগ রেশনের চাল কাঁকর বা প্রায় অ-খাদ্য—কেন দানের-দুধ ও মাখন বিক্রী হয় বাজারে—হাত আছে অথচ কেন কাজ নেই—এসবের উত্তর বা পথনির্দেশ ফ্র্যাংকলি জানি না—তবু সমস্ত জীবন জুড়ে চেষ্টা করে যাবো যে ছিদ্রগুলি আমরা দেখেও দেখি না—সেইদিকে আঙুলি নির্দেশ করে দাখাবো। সত্য ও সুন্দরকে মেলাতেও চাই আমার কবিতায়—কবিতা লেখার যোগ্য হয়ে উঠতে চাই প্রতিদিন—আমার কবিতার জন্ম প্রগাঢ় ভালবাসা থেকে—

যে কোনো মূল্য বেঁচে থাকার নাম-ই কি বাঁচা ? আমার স্থির বিশ্বাস যে, পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে আর কিছুই ভালো নয়—মানুষই আমার প্রিয় বিষয় আর লেখার পক্ষে, এই গোলমেলে সময়টাই মনে হয় সুসময়। আমি জানি, ঠিক এই সময়ে ভদ্র ও সরলদের বলা হয় 'বোকা' প্রকৃত ধার্মিকদের 'ভণ্ড' এবং ঈশ্বর বিশ্বাসীদের 'নির্বীর্য'—দয়ালুদের হয়তো বলা হবে 'মেয়ে মানুষ'—সত্যের প্রতি আন্তরিকতা 'পাগ্‌লামি'—কেননা এখন শক্তি, লোভ ও ভোগের খেলা চলেছে সবচেয়ে বেশি।

হায়, আমি যদি পারতাম ।। দেবী রায়

চাওয়ামাত্র-ই আমি যদি পারতাম ঃ
জগৎ বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ান পি, সি, সরকারের
মতো—দুই বাঙলার মধ্যকারের—
বেয়নেট উঁচানো-কাঁটাতারের সীমানা
উঠিয়ে দিতাম—এক লহমায়

যে খেতে চায়, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত
কখনো দিতাম না আমি, এগিয়ে—
বিশ্বাসযোগ্য এক গোছা রুটি
বিছানায় ছটপট, এপাশ-ওপাশ—
চিন্তিত-মানুষের দু'চোখে এনে দিতাম
সহজ নির্ভার ঘুম
আর অসুখী-কপালে এনে দিতাম
মাদুর-বিছানো, মেঘময় শান্তি !

যে চেয়েছে, যারা চাইতো—তাদেরই হাতে
তুলে দিতাম কাজ
পারলে, আজ
আজ-ই তিলমাত্র দেরী না করে
নোংরা রাজনীতির ঘৃণ্য পথে
কখনো দিতাম না ঠেলে
কাঙাল, ওরা কাঙাল সামান্য একটু ভালোবাসার
আশ্বাস ওরা পেলে
দেশের চেহারা-ই দিতে পারে—পাল্টে, রাতারাতি
জ্বেলে দিতো স্বচ্ছন্দে, আঁধার ঘনানো পথে
কতো না সহজেই, বাতি !
প্রমান ক'রে, তবেই আমি ছাড়তাম !

ওহো ! আমি যদি পারতাম !
এইসব ঠোঁট সর্বস্ব-ধান্দাবাজ নেতাদের মুখ—
থেকে নিতাম কেড়ে মাইক,
উস্কানী-দেওয়া কলমবাজদের হাত থেকে কলম।
বিনিময়ে, দিতাম উপহার, কোদাল-গাঁইতি
কাস্তে-লাঙল-বীজধান—
এই সব, ঠিক !

বোঝাতাম, আমি বোঝাতাম ঃ
চেয়ে দ্যাখো হে, 'অস্তায়মান-সূর্য
এখনো এতো রঙ ছড়ায়'
আর 'নীরবতা যখন সবচেয়ে বেশি বাঙময় !'

হায়। আমি যদি পারতাম !!

বিদেশী কবিতা

পিয়ের র‍্যভেদি ।। পরেশ মণ্ডল

'র‍্যভেদি জীবিত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' লিখেছিলেন আরাগঁ, ব্রার্তঁ, সুপোল (১৯২৪ খৃঃ)। র‍্যানে শার র‍্যভেদিকে আপোলিন্যের-এর চাইতে বেশি পছন্দ করতেন। সমকালীন রসিকজনও চমকে গিয়েছিলেন এই ফরাসী কবির আবির্ভাবে। কারণ, তাঁর কবিতার পদবিন্যাস ও বাগধারা ছিল অভিনব এবং বিস্ময়কর। কিউবিস্ত্ চিত্রশিল্পী হোয়ান গ্রী-র ঘনিষ্ট বন্ধু র‍্যভেদি। র‍্যভেদি কিউবিস্ত্ কবি। তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় অনুভব যন্ত্রণা। 'পৃথিবীটা আমার কারাগার'—তাঁর অনায়াস উচ্চারণ।

১৮৮৯খৃঃ সারবন-এ পিয়ের র‍্যভেদির জন্ম, মৃত্যু সলেম-এ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে। একুশ বছর বয়সে চিত্রশিল্পী ও কবিদের আর্ভ-গার্দ গ্রুপের সদস্য হন তিনি। আপোলিন্যের ও পিকাশো ছিলেন এই দলের প্রধান দুই সদস্য। ১৯১৭ খৃঃ র‍্যভেদি 'নর-সুদ' (Nord-Sud) এর প্রতিষ্ঠা করেন, নর-সুদ ছিল সুররে আলিস্‌ম্-এর ভিত্তিপ্রস্তর। দাদা ও সুররেআলিস্‌ম্ আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব রচনায় র‍্যভেদি-র অবদান উজ্জ্বল। তাঁর কবিতা শুদ্ধ গাঢ়, মিতবাক, কোমল, ইংগিতময়। মালার্মে তাঁর Un coup de de´s-তে যে কাব্যপ্রকরণের অবতারণা করেছিলেন, র‍্যভেদি তারই সার্থক উত্তরসূরী।

লক্ষণীয়, বাংলা কাব্যের যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৮) ও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮)-এর সমবয়সী এবং সমকালীন র‍্যভোঁদি (১৮৮৯)। সময়ের দিক থেকে এঁরা কাছাকাছি, কিন্তু কবিতায় সুদূর।

র‍্যভেদি-র কবিতা ছেদচিহ্নবর্জিত ; ছন্দ গদ্যের ; ভাবপ্রতিমা বিচ্ছিন্ন, আকস্মিক, কিন্তু সতর্ক। কবিতাগুলি ঘন, স্থির, পরিমিত। বোঝা যায়, দুধে জল মেশানোয় কবি বীতস্পৃহ।

নানা মুনির নানা মত—র‍্যভেদি বাস্তববাদী, সুররেআলিস্ত্, কিউবিস্ত, মিস্টিক, লিরিক। কিন্তু শেষাবধি, র‍্যভেদি কিউবিস্ত্ কবি।

পিয়ের র‍্যভেদির কয়েকটি কবিতা

১ প্রস্থান

দিগন্ত ঝুঁকে পড়েছে
দি ওলো বেড়ে যাচ্ছে
ভ্রমণ
খাঁচার মধ্যে একটা হাৎপিণ্ড লাফাচ্ছে
একটা পাখি গান গাইছে
হয়তো মরার জন্যে
অন্য দরোজা খুলে যাচ্ছে
হলঘরের শেষে
যেখানে ঝলকে উঠছে
একটা তারা
একজন রহস্যময় মহিলা
অপসৃয়মান ট্রেনের আলোটা

২. ঘণ্টার ধ্বনি

সব ফুরিয়ে গেছে
গান গাইতে গাইতে বাতাস বয়ে যাচ্ছে
এবং গাছগুলো শিউরে উঠছে
পশুরা মৃত
আর কেউ নেই
দেখো
তারাগুলো নিভে গেছে
পৃথিবী ঘুরছে না
একটা মাথা ঝুঁকে পড়ছে
তার চুল রাতের ওপর ছড়ানো
শেষ ঘণ্টাঘর থমকে গেছে
রাত বারোটা

৩. স্থির প্রকৃতি-চিত্র

সিগারেট-পেপার ক্যালেণ্ডার এবং সিগারেট-মিকাশ্চর
প্রকৃতি
চিত্রের মতো
স্থির
এবং সাহিত্য
টাক-নাথা
সোজা দৃষ্টি
কমা
একটা চ্যাপটা নাক সমান
কপালের ওপর
আমার প্রতিকৃতি

আমার হৃৎপিণ্ড চলছে
এবং সেটা একটা পেন্ডুলাম
আয়নার মধ্যে আমার পুরো প্রতিচ্ছবি
আমার মাথা থেকে ধোঁয়া উড়ছে

৪. আমার সামনেকার পৃথিবী

কিছুদিন আগে
পরিষ্কার রাত্রি
নতুন সূর্যোদয়
পরের দিন
একটা বুড়ো লোক হাঁটুর ওপর হাতদুটো
রাস্তা দিয়ে প্রাণগুলো ছুটে গেল

আমি বসে আছি
আমি স্বপ্ন দেখেছি
মাথার ওপর একটা জানলা খুলে যায়
কেউ বাড়ি নেই
বেড়ার আড়ালে একটা লোক চলে যায়

সেই গ্রামাঞ্চল যেখানে মাত্র একটা পাখি গান গায়
কেউ ভীত
কেউ খুশি
দুটি শিশুর মাঝখানে সেখানে
আনন্দ
তুমি আমার মুখোমুখি
চোখের জল ধুয়ে দেয় বৃষ্টি

সরু রাস্তায় হাঁটা যায় না
একই পথে ফিরে যেতে হয়
একটা দরোজা
কিছু যেন পড়ে যায়
পেছনে

নিজের চেয়ে বড় ছায়া
পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে
এবং আমি—আমি বসে থাকি এবং উপেক্ষার সঙ্গে তাকাই

অনুবাদক ঃ পরেশ মণ্ডল

অনুভব ॥ কবিতার মাসিক ॥ প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ॥ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ ॥ আট পয়সা
ANUBHAV (Poetry Monthly), VOL. I No. 3. SEPT. 1974. PRICE 60 PAISE

গৌরাঙ্গ ভৌমিক সেই কবি, যাঁর কবিতায় কোলাহল করে সময়। কিছুকাল আগে তিনি যুদ্ধ করেছেন নিজের বিরুদ্ধে। এখনও বলেন, 'স্বনিমিত মুকুটে যিনি সম্রাট নন, সে কবির মৃত্যু হোক অপঘাতে।' তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক উল্‌থা প্রকাশন।

নদীর সময় ।। গৌরাঙ্গ ভৌমিক ।। তিন টাকা ।।
অশুভ সঙ্গীত ।। গৌরাঙ্গ ভৌমিক চার টাকা ।।

সাম্প্রতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ ধরের কবিতা একটি প্রবল প্রতিবাদ। কবিতার চেয়েও সার্থক তিনি কাব্য নাটকে। কাব্য নাটকে ব্যবহৃত তাঁর ভাষায় ঘটেছে লৌকিক, অলৌকিকের সার্থক সম্মিলন। পড়েছেন কি তাঁর কোনো কাব্যনাটক ?

পদধ্বনি পলাতক ।। কৃষ্ণ ধর

হিন্দী কবিতার ক্ষেত্রে শলভ শ্রীরাম সিং স্বাতন্ত্রে চিহ্নিত একটি নাম। শলভ বলেন 'কুকুর আর সমালোচকদের আমি ঘৃণা করি।' তাঁর একুশটি কবিতার অনুবাদ করেছেন শ্রীজয়ন্ত কুমার।

ঘুমন্ত দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ ।। শলভ শ্রীরাম সিং
অনুবাদ জয়ন্তকুমার

হিন্দী পাঠকদের জন্য বাংলা সাহিত্য
মুঝে জিনে দো মুঝে জাগনে দো ।। মণীন্দ্র রায় ।। চার টাকা ।।
নদী কা সময় ।। গৌরাঙ্গ ভৌমিক ।। চার টাকা ।।
পিপাসা ।। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ।। আট টাকা ।।

উল্‌থা প্রকাশন/৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, (আণ্ডার গ্রাউণ্ড নং ২)
কলকাতা-১২

EDITOR : JAYANTKUMAR
Published by Sri Virendra Nath Mishra from 33, Chittaranjan Avenue (Underground No. 2) Calcutta-12 Printed by A.K. Dey Hazra from Chandimata Printers & Stationers, Haripur Road, Cuttack-1.
Cover ; BARUN SIMLAI